বঙ্গবন্ধু স্মরণে

বিশেষ ক্রোড়পত্র

জাতীয় শোক দিবস

১৫ আগস্ট ২০১০

বাংলাদেশ দূতাবাস

৪২, কুয়াংহুয়া লু,বেইজিং-১০০৬০০
টেলিফোন ঃ +(৮৬-১০) ৬৫৩২ ২৫২১
ফ্যাক্স ঃ +(৮৬-১০) ৬৫৩২ ৪৩৪৬
ই-মেইলঃ bdemb@public3.bta.net.cn

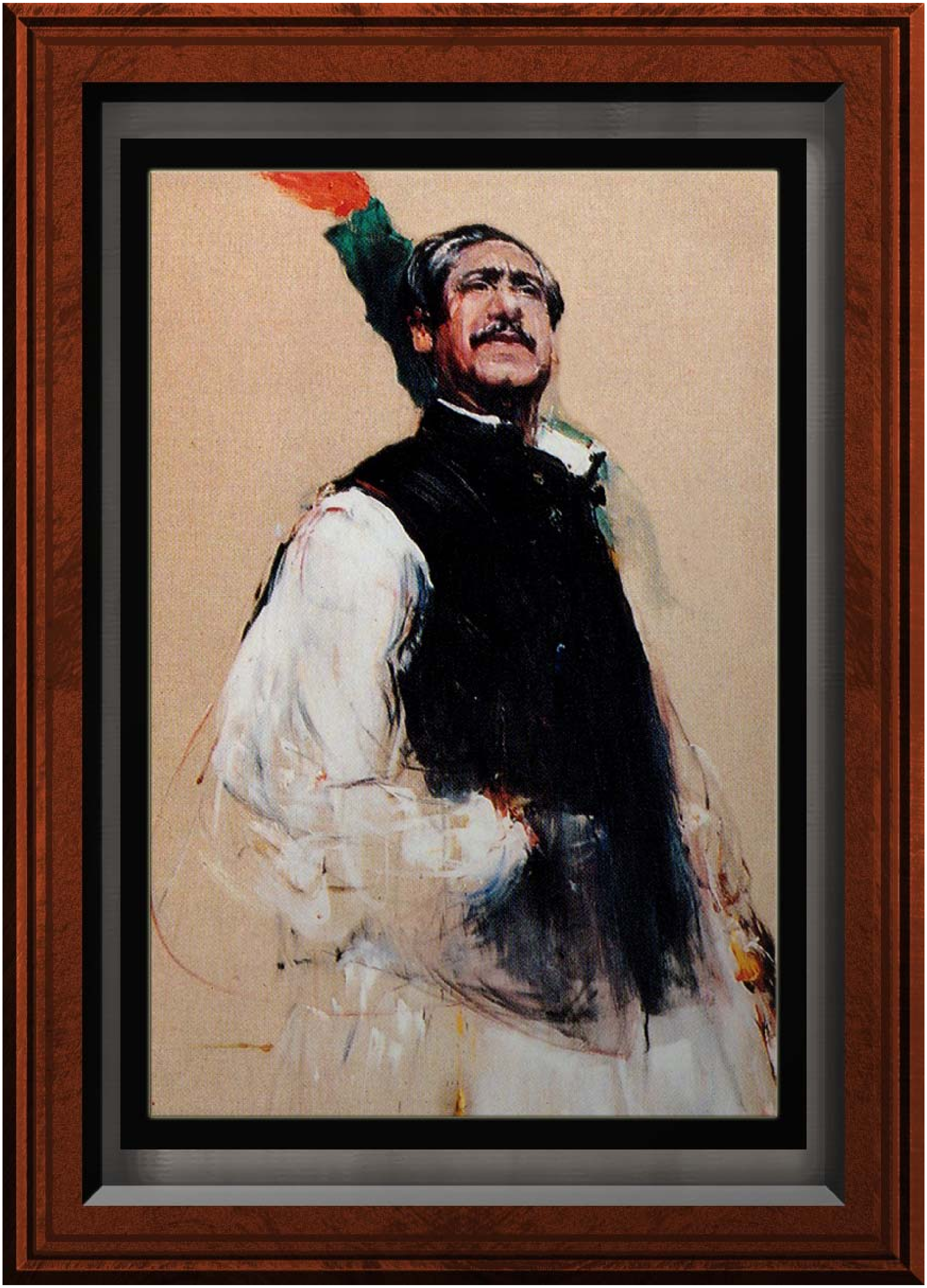

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

ঢাকা।

৩১ শ্রাবণ ১৪১৭
১৫ আগস্ট ২০১০

বাণী

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। বাঙালি জাতির শোকাবহ দিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৫তম শাহাদৎ বার্ষিকী আজ। আমি এ দিনে শোকাহত চিত্তে গভীর শ্রদ্ধা জানাই মহান স্বাধীনতার স্থপতি, কালজয়ী শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের অম্লান স্মৃতির প্রতি।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। দেশের স্বাধীনতা বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে ঘাতকচক্রের হাতে নিজ বাসভবনে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ হন। হত্যা করা হয় বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশুপুত্র শেখ রাসেল, পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, সহোদর শেখ নাসের, কৃষকনেতা আবদুর রব সেরনিয়াবাত, যুব নেতা শেখ ফজলুল হক মনি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি, বেবী সেরনিয়াবাত, সুকান্ত বাবু, আরিফ, আব্দুল নঈম খান রিন্টুকে। জাতীয় শোক দিবসে আমি পরম করুণাময় আল্লাহ'র দরবারে সেদিনের সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

আমাদের জাতীয় ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর অবদান অপরিসীম। তাঁরই নেতৃত্বে বাঙালি জাতি অর্জন করে বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে তদানিন্তন '৫৮ এর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, '৬৬ এর ৬-দফা, '৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান, '৭০ এর সাধারণ নির্বাচনসহ এ দেশের গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে তিনি এই জাতিকে নেতৃত্ব দেন। এ জন্য তাঁকে বহুবার কারাবরণসহ অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে এদেশের জনগণকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে এই মহান নেতা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ মহান স্বাধীনতা। এ জন্য পুনরায় তাঁকে কারাবরণ করতে হয়, যেতে হয় ফাঁসির মঞ্চে। তবুও তিনি শত্রুর সাথে আপোস করেননি। দেশ ও জনগণের স্বার্থকে সারাজীবন সমুন্নত রেখে গেছেন। তাই ঘাতকচক্র জাতির জনককে হত্যা করলেও তার আদর্শ ও নীতিকে ধ্বংস করতে পারেনি। এ দেশ ও জনগণ যতদিন থাকবে, ততদিন জাতির জনকের নাম এদেশের লাখো-কোটি বাঙালির অন্তরে চির অক্ষয় হয়ে থাকবে।

আশার কথা, দীর্ঘ ৩৫ বছর পরে হলেও জাতির জনক ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যাকারী ঘাতকদের বিচার বাংলার মাটিতে সম্পন্ন হয়েছে। জাতি আজ অনেকটা কলঙ্কমুক্ত। যেসব মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ঘাতক আজো বিদেশে পালিয়ে রয়েছে, তাদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের রায় কার্যকর করতে সর্বোচ্চ তৎপরতা চালাতে হবে। জাতি জানবে-হত্যাকারীদের ঠাঁই পৃথিবীর কোথাও নেই।

জাতির জনক 'সোনার বাংলা'র স্বপ্ন দেখেছিলেন। আমাদের দায়িত্ব হবে দেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করে জাতির জনকের সেই স্বপ্ন পূরণ করা। তা হলেই তাঁর আত্মা শান্তি পাবে এবং আমরা এই মহান নেতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে পারবো।

জাতীয় শোক দিবসে আসুন, আমরা জাতির জনককে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তর করি এবং দেশ গঠনে আত্ম-নিয়োগ করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জিল্লুর রহমান

মোঃ জিল্লুর রহমান

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩১ শ্রাবণ ১৪১৭
১৫ আগস্ট ২০১০

বাণী

পনেরই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। ১৯৭৫ সালের এই দিনে মানব ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাকান্ডের শিকার হয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে শাহাদাতবরণ করেন।

হত্যা করা হয় বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, পুত্র ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, লেঃ শেখ জামাল, ছোট শিশু শেখ রাসেল, পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, সহোদর শেখ নাসের, কৃষকনেতা আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনি, তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি, বেবী সেরনিয়াবাত, সুকান্ত বাবু, আরিফ, আব্দুল নঈম খান রিন্টুসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে। হত্যা করা হয় বঙ্গবন্ধুর সামরিক সচিব কর্নেল জামিলকে। ঘাতকদের নিক্ষিপ্ত কামানের গোলার আঘাতে মোহাম্মাদপুরে একটি পরিবারের বেশ কয়েকজন নিহিত হয়।

জাতীয় শোক দিবসে আমি মহান আল্লাহতায়ালার দরবারে সেদিনের সকল শহীদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী, গতিশীল এবং ঐন্দ্রজালিক সাহসী নেতৃত্বে এই ভূ-খন্ডের মানুষ হাজার বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। বাঙালি পেয়েছে নিজস্ব জাতিরাষ্ট্র।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে বঙ্গবন্ধু যখন সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত তখনই তাঁকে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করার অপপ্রয়াস চালায়। অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোকে ভেঙে ফেলাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য।

হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি শুরু করে হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে সংবিধান স্থগিত করে মার্শাল ল' জারি করা হয়। সেনাশাসক জিয়া গণতন্ত্রকে হত্যা করে দেশে কায়েম করে সামরিক একনায়কতন্ত্র। কালাকানুন জারি করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের পথ রুদ্ধ করা হয়। পক্ষান্তরে জাতির জনকের হত্যাকারীদের পুরস্কৃত করা হয়।

অবশেষে শত শহীদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জনগণের ভোটাধিকার। সেই অধিকার প্রয়োগ করে জনগণ আওয়ামী লীগকে দেশ পরিচালনার সুযোগ করে দেয়। গঙ্গার পানি চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তি, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, দারিদ্র বিমোচনে অগ্রগতি, গণশিক্ষার অভাবিত সাফল্য, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ কল্যাণমুখী সমাজ গঠনে আওয়ামী লীগ সরকার সফলতা অর্জন করে। মানুষ ফিরে পায় হারানো আস্থা ও এগিয়ে যাওয়ার আত্মবিশ্বাস। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ছিল বাংলাদেশের স্বর্ণযুগ।

কিন্তু ২০০১ সালের অক্টোবরের কারচুপির নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতা দখল করে কায়েম করে লুটেরা রাজনীতি। স্থবির হয়ে পড়ে উন্নয়নের চাকা। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল ছিল এদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংসের অধ্যায়।

চলমান পাতা -২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আওয়ামী লীগসহ সকল বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে সারাদেশে একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করাই ছিল তখনকার সরকারের মূল লক্ষ্য। এই পরিকল্পনারই অংশ হিসেবে ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলা করে আমাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। আল্লাহর অশেষ রহমত ও জনগণের দোয়ায় আমি কোনক্রমে বেঁচে গেলেও সেদিন নিহত হন আইভি রহমানসহ আওয়ামী লীগের ২৪ জন নেতাকর্মী।

এরপরও বাঙালি আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে জনগণ আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করে। বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা দিয়ে 'রূপকল্প ২০২১' তুলে ধরে দিন বদলের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি।

আমরা ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করে জাতিকে কিছুটা কলঙ্কমুক্ত করেছি। বাকী আসামীদেরও দেশে ফিরিয়ে এনে রায় কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জাতীয় চার নেতার হত্যার বিচার ত্বরান্বিত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকার যখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে, তখন জনগণের ভোটে প্রত্যাখ্যাত শক্তি ষড়যন্ত্র ও অরাজকতার মাধ্যমে উন্নয়ন এবং গণতন্ত্রের অভিযাত্রাকে ব্যাহত করতে চাচ্ছে। এদের সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।

ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেও জনগণের কাছ থেকে তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শের মৃত্যু ঘটাতে পারেনি। পনের কোটি বাঙালির অন্তরে প্রোথিত রয়েছে তাঁর ত্যাগ ও তিতিক্ষার সংগ্রামী জীবনাদর্শ। আসুন, জাতির জনককে হারানোর শোককে শক্তিতে পরিণত করে তাঁর স্বপ্ন সোনার বাংলা বাস্তবায়নের সংগ্রামে এগিয়ে যাই।

ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত এবং অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ একটি গণতান্ত্রিক শান্তিকামী ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে আমাদের অবশ্যই জয়ী হতে হবে।

ইনশাআল্লাহ্ জয় আমাদের হবেই। খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

15 AvMó 2010

বাণী

AwR 15 AwM÷| evsjv‡`‡ki gvbl AvR RwZi RbK e½eÜ †kL gwRei ingv‡bi 35Zg kvnv`vZ ewlKx‡Z †kvKwffZ| e½eÜ wQ‡jb ¯vaxb evsjv‡`‡ki ¯cwZ, hM‡kô GKRb ivóbvqK Ges evOwj RwZ‡K mKj ai‡Yi eÂbv, wbcxob I wbhvZb †_‡K g³ Kivi cw_KZ| GB Kv‡jv w`‡b e½eÜ‡K Zvi cwiev‡ii 18 Rb m`m¨mn bksmfv‡e nZ¨v Kiv nq| GUv wQj gvbe BwZnv‡m RNb¨Zg GKwU ivR‰bwZK nZ¨vKvÛ|

AvR Awg Mfxi fvivµvš ü`‡q e½eÜi Agwjb ¯§wZi cwZ Avšwi K k×v Rvbw"Q Ges 1975 mv‡ji 15 AvM†÷i knx`‡`i AvZ¥vi gvM‡divZ Kvgbv KiwQ|

e½eÜ Zvi A`g¨ Ges m‡¤§vnbx †bZ‡Zi gva¨‡g mv‡o mvZ †KwU evOwj‡K Zv‡`i ghv`v I RwZMZ gj¨‡eva m¤ú‡K evi evi AbcwYZ K‡iwQ†jb| 1952 mv‡ji gnvb fvlv Av‡›`vjb, 1958 mv‡ji mvgwiK kvmb we‡ivax Av‡›`vjb, 1966 mv‡ji 6 `dv Av‡›`vjb, 1969 Gi MY Af¨Ìvb Ges 1970 Gi mvaviY wbevP‡b evOwji MYZwšK AwaKvi c‡qvM - cwZwU‡Z e½eÜ Zvi wePÿY †bZZ w`‡q evOwj RwZ‡K D¾xweZ K‡i‡Qb| e½eÜi 7B gv‡Pi D`vË AvnŸvb Ges 1971 mv‡ji 26 gv‡Pi ¯vaxbZvi †NvlYv GKbvqKZ‡ši fxZ‡K Kwc‡q w`‡q evOwji ¯vaxbZv msMvg‡K Povš i/c`vb K‡i| djk"wZ‡Z evOwj RwZ eû cZxwÿZ ¯vaxbZv ARb K‡i wek gvbwP‡Î mve‡fŠg ivó wn‡m‡e cwiwPwZ jvf K‡i| e½eÜi AwMSiv e³Zv Ges `i`kx †bZZ GLbI we‡ki wbhwZZ, ¯vaxbZvKvgx gvb‡li Kv‡Q wPi Ab‡ciYvi Drm n‡q Av‡Q|

¯vaxbZwe‡ivax kw³ e½eÜ‡K ce cwiKwíZfv‡e nZ¨v K‡i ïagvÎ Zv‡K Zvi h×weaŸ¯ evsjv‡`k‡K cbMVb KgmwP †_‡KB wePz¨Z K‡iwb, Dciš Zvi mviv Rxe‡bi cMwZkxj I D`vi gj¨‡eva‡KI aŸsm Kivi Ac‡Póv Pwj‡q‡Q| ZvB 15B AvM÷ evOwj RwZi BwZnv‡m GKwU Kjw¼Z Aa¨vq, †hw`b RwZ Zvi RbK‡K wPiZ‡i nwi‡qwQj| Z‡e Lbxiv RwZi RbK‡K nZ¨v Ki‡jI Zvi Av`k I bxwZ‡K nZ¨v Ki‡Z cv‡i bvB, hv AvRI cw_exi mKj ¯vaxbZvKvgx RbMY‡K D¾xweZ K‡i|

e½eÜi kvnv`vZ ei‡Yi mv‡o wZb `kK c‡iI Zvi ¯†c jwjZ evOwj RwZ GKwU †kvlY, `wi` I mv¤ú`wqKZvg³ †mvbvi evsjv Movi `p cZ¨q Zv‡`i ü`‡q Mfxifv‡e aviY K‡i‡Q| GiB djk"wZ‡Z 2008 mv‡ji 29 wW‡m¤‡ii wbevP‡b evsjvi RbMY e½eÜ Kb¨v †kL nwmbv‡K AfZce mg_b w`‡q wbewPZ K‡i Ges 2021 mv‡ji g‡a¨ evsjv‡`k‡K GKwU cMwZkxj ga¨g Av‡qi chw³mgx ivó wn‡m‡e M‡o †Zvjvi g¨v‡ÛU †`q| e½eÜ GKRb wbfxK `Z wn‡m‡e ‡h mg¯ cMwZkxj gj¨‡eva cwZôvi Rb¨ msMvg K‡i †M‡Qb, †hgb - kwš, b¨vqwePvi, MYZš, Amv¤ú`wqKZv I mK‡ji Rb¨ mgvb AwaKvi, †mBme gj¨‡eva‡K msiÿY Ki‡Z eZgvb miKvi `pcwZÁ|

eZgvb miKvi Zvi wbevPbx cwZk"wZ †gvZv‡eK e½eÜi Lbx‡`i wePv‡ii m¤§Lxb Kivi mevZ¥K c‡Póv MnY K‡i‡Q| B‡Zvg‡a¨ Lbx‡`i wePvi m¤úb K‡i wePv‡ii ivq I KvhKi Kiv n‡q‡Q| †hme Acivax GLbI we‡ki wewfb †`‡k cjvZK i‡q‡Q Zv‡`i‡K †`‡k G‡b wePv‡ii m¤§Lxb Kivi c‡Póv Ae¨vnZ i‡q‡Q| GKwU ¯vaxb AvšRwZK Aciva UvBebvj Gi gva¨‡g miKvi 1971 mv‡ji h×vcivax‡`i wePv‡ii e¨e¯v MnY K‡i‡Q| e½eÜi evKx Lbx‡`i †`‡k wdwi‡q G‡b GB wePv‡ii ivq KvhKi Kiv I h×vcivax‡`i wePvi KvR môfv‡e m¤úv`b Kivi gva¨‡g ïa †h AvB‡bi kvmb mgbZ n‡e ZvB bq, eiÂ ¯vaxbZv, mv¤ú`wqKZv I wePvinxbZvi wei"‡× ¯vaxbZv, agwbi‡cÿZv I b¨vq wePv‡ii cwZKx Rq n‡e|

RwZi Rb‡Ki GB ggwšK kvnv`vZ w`e‡m Awg †`‡k we‡`‡k Ae¯vbiZ mKj evOwj‡K e½eÜi Av`k ev¯evq‡bi Rb¨ bZb K‡i kc_ †bqvi Avnevb RvbvB| Avmb Avgiv Ggb GKwU †mvbvi evsjv M‡o Zwj †hLv‡b 16 †KwU evOwj `wi`, Awkÿv, mv¤ú`wqKZv I mKj cKvi ˆelg¨ †_‡K gw³ cvq, MYZš, AvB‡bi kvmb I b¨vqwePv‡ii AwaKvi †fvM Kivi cqvm cvq I AvZ¥ghv`vkxj, mg×kvjx evOwj RwZ wn‡m‡e cw_exi e‡K `p Ae¯vb mmsnZ Ki‡Z mÿg nq|

Dipu Moni

ডঃ দীপু মনি, এমপি
পররাষ্ট্র মন্ত্রী

বাঙালির স্মৃতিতে অমর বঙ্গবন্ধু

প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

১৯৭৫-এর পনেরই আগস্টের মতো মর্মান্তিক দুর্ঘটনা কোনো জাতির জীবনে বেশি ঘটেনা। এই হত্যাকান্ড বিশ্বাসঘাতকতার ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার একটি চরম দৃষ্টান্ত। বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিই ছিলেন না, ছিলেন জাতির জনক, ছিলেন বাংলাদেশের স্থপতি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিল প্রবাসী সরকার। তিনি সেই সরকারের ঘোষিত প্রেসিডেন্ট, যদিও পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তিনি প্রবলভাবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত। তিনি উপস্থিত ছিলেন সকল বাঙালির চেতনায়, এবং অবশ্যই প্রবাসী সরকারের সকল কর্মকান্ডের প্রেরণা হয়ে। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল তারই নামে। তাঁর অবর্তমানে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। ঘাতকেরা শুধু সেদিনের রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করেনি, তাঁর পরিবারের উপস্থিত সকল সদস্যকে হত্যা করে। নারী, শিশু কেউ অব্যাহতি পায়নি সেই নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ থেকে। বিশ্বের ইতিহাসে এর নির্মম সহিংসতার তুলনা মেলা ভার। এই সহিংসতা ও নিমর্মতা বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে ছাড়িয়ে বিস্তৃত হয়েছিল তাঁর নিকটাত্মীয় আরও দুটি পরিবারে। আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল যুগপৎ তিনটি বাড়ীতে। পৃথক অবস্থানে বঙ্গবন্ধুর ভাগিনেয় শেখ মনির বাসগৃহ, ও ভগ্নিপতি সেরনিয়াবাতের বাসগৃহ আক্রান্ত হয়। তিনটি পরিবারের সন্তানসহ ঐ আক্রমণে সর্বমোট ৩৭ জন নিহত হন।

বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহ বিমানযোগে তাঁর পৈত্রিক বাড়ী টুঙ্গীপাড়ায় নিয়ে যায় ঘাতকের লোকেরা, যারা ছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্য। তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় চরম অবজ্ঞায়। অত্যন্ত দায়সারাভাবে তাঁর দাফনে যেটুকু আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা করা গিয়েছিল, তা সম্ভব হয়েছিল কতিপয় গ্রামবাসীর চাহিদা মোতাবেক। অন্যদের বেলায় তা-ও সম্ভব হয়নি। বনানী গোরস্তানে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াই সমাধিস্থ হন বঙ্গবন্ধু পরিবারের ও দুই আত্মীয় পরিবারের সদস্যরা।

এই নির্মম ঘটনা ছিল একেবারেই অচিন্তনীয়। বঙ্গবন্ধু কখনো তাঁর সম্ভাব্য হত্যা বিষয়ে কোনও হুঁশিয়ারী গ্রাহ্য করেননি। তিনি গণভবনের নিরাপত্তায় থাকার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। ধানমন্ডির স্বগৃহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলতে যা ছিল তা একজন রাষ্ট্রপতির উপযোগী নয়। তিনি নিশ্চয়ই সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কোন বাঙালি তাঁকে হত্যা করবে না। তিনি যাদের প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছেন, তারাও তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, এই যে তাঁর সরল বিশ্বাস, এ বিশ্বাস তার মতো মহৎ মানুষের পক্ষেই সম্ভব। প্রাণ দিয়ে তিনি এই বিশ্বাসের মূল্য দিয়ে গেলেন, যেমন দিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তাকেও তাঁর সরকারি বাসভবনের শিখ দেহরক্ষীদের বিষয়ে সর্তক করা হয়েছিল, তিনি তা গ্রাহ্য করেন নি। সামনে দাঁড়ানো সশস্ত্র ঘাতকদের দেখেও বঙ্গবন্ধু বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারেননি, তারা খুন করতে এসেছে। না হলে তাঁর মুখ দিয়ে বেরুত না, তোরা কী চাস্– এই স্বভাবসম্মত উক্তি।

এই প্রশ্নের উত্তর তারা দিয়েছিল বন্দুকের ট্রিগ্রার টিপে। গুলিতে গুলিতে তাঁর দেহ ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল। সেখানে থামেনি। এর পর তাদের লক্ষ্য পরিবারের অন্য সকল সদস্য। নিস্পাপ বালক বঙ্গবন্ধুর ছোট সন্তান রাসেলও রক্ষা পেলনা এই জল্লাদদের হাত থেকে।

এই অমানুষিক হত্যাকান্ডের হোতারা কারা, এবং তারা কী চেয়েছিল, এ নিয়ে আজ আর বড়ো বেশি বির্তক বা অস্পষ্টতা নেই। তারা যদিও আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তি শেখ মুজিবকে হত্যা করেছে, কিন্তু তাদের হত্যার পরিধি বিচার করলে এবং সেই পরিধির বিস্তার নভেম্বরের চার নেতার হত্যার কথা বিবেচনা করলে, সন্দেহ থাকে না। তারা ব্যক্তিকে হত্যা করেনি, তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার আত্মাকে হত্যা করেছে। হত্যার দায় তারা কখনো অস্বীকার করেনি, বরং গর্বের সাথে স্বীকার করেছে এবং সদর্পে বলেছে, আমি খুনী, পারলে ওরা আমার বিচার করুক।

ঘাতকদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তারা চিরদিন থাকবে বিচারের ঊর্ধ্বে। এ বিশ্বাস ভিত্তিহীন ছিলনা। হত্যার পরপরই যারা ক্ষমতায় এল, তারা আইন পাশ করে তাদের বিচারের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। এই ইনডেমনিটি অ্যাক্ট ছিল তাদের রক্ষা কবচ। এ ছাড়াও ছিল, হত্যা পরবর্তী সরকারের সর্বাত্মক সহযোগিতা। দেশে নয়, বিদেশে সরকার তাদের দেখভাল করেছে, বিদেশের দূতাবাসে চাকরি দিয়েছে, শুধু আইনের নিরাপত্তা দিয়ে সন্তুষ্ট থাকেনি, তাদের পুরস্কৃত করেছে। একই সঙ্গে, তারা মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে বাতিল করে নতুন বাংলাদেশ গঠনে মনোযোগী হয়েছে। এই নতুন বাংলাদেশ হবে বাংলাদেশের পাকিস্তানী সংস্করণ। এখানে ধর্মনিরপেক্ষতা শুরুতেই পরিত্যাজ্য। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ধর্মের যে মর্যাদার জায়গা ছিল পাকিস্তানে, সেটা সাড়ম্বরে ফিরিয়ে আনা হল। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল, যা নিষিদ্ধ হয়েছিল বাংলাদেশের সংবিধানে, তাদের

প্রত্যাবর্তনের পথ সুগম করা হল। সংবিধানের সংশোধন যা করা হল, সবগুলির উদ্দেশ্য এক: সমাজতন্ত্র ও ধর্ম-নিরপেক্ষতা মুছে দিয়ে, সংবিধানকে নতুন বাংলাদেশের উপযোগী করে পুনর্নির্মাণ। এতেও সন্তুষ্ট হলেন না, জিয়াউর রহমানের উত্তরসূরী– তিনি ৮ম সংশোধানীর মারফৎ ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করলেন। সেকুলারিজমের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দিলেন তিনি।

নতুন বাংলাদেশের সকল সরকার '৭৫ এর ১৫ই আগস্টের হত্যাকান্ডের প্রশ্নে দৃষ্টিভঙ্গীর ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে। এই হত্যাকে তারা অপরাধ বিবেচনা করেনি। এই হত্যার বিচারের কোনও উদ্যোগ তারা গ্রহণ করেনি। সে-উদ্যোগ নিতে হয়েছে '৯৬-এর নির্বাচনে জয়ী শেখ হাসিনার সরকারকে সরকারের প্রথম পাঁচ বৎসরের মেয়াদে পঁচাত্তরের হত্যাকান্ডের বিচার হয়েছে, দেশের সাধারণ আইনে, তবে বিচারের পরিণতি দেখে যেতে পারেনি সরকার। পরবর্তী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসতে পারেনি, ক্ষমতায় এসেছে যে জোট সরকার, সে সরকারের অংশীদার ছিল জামায়াত ইসলামী। সুতরাং প্রথম আওয়ামী লীগ সরকারের আরম্ভ কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়। ২০০৮ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও মহাজোট বিপুলভাবে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় ফিরে আসার পর, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার তার পরিণতি লাভ করে হত্যার ৩৪ বছর পর ২০০৯ সালে। হত্যা অপরাধে যারা অপরাধী হিসেবে দন্ডিত হয় তাদের প্রাণদণ্ড কার্যকর হয়, অংশত। পলাতক অপরাধীরা আজ পর্যন্ত আইনের নাগালের বাইরে রয়ে গিয়েছে।

এক দিক দিয়ে, '৭৫ পরবর্তী হতাশা ও অপেক্ষার দীর্ঘরাত্রির অবসান হয়েছে বর্তমান সরকারের অধীন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে। আমাদের প্রায় চল্লিশ বৎসরের ইতিহাসে এ এক বড়ো প্রাপ্তি। কে ক্ষমতায় এল, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন স্থায়ী হয়েছিল বিশ বৎসরের অধিক। এর অবধারিত ফল হয়েছিল, বিচার বিভাগের পঙ্গুত্ব। ঘৃণ্যতম অপরাধের বিচার করা সম্ভব হয়নি সেই পক্ষাঘাতগ্রস্থ বিচার ব্যবস্থায়। আজ সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক পরিবর্তন হচ্ছে সেই বিচার বিভাগকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার লক্ষণসমূহ।

২০০৮-এর নির্বাচনে আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে মহাজোটের বিজয়, জনগণের একটি দাবীর বিজয় বলে গণ্য হবে। সে দাবী, ১৯৭২ এর সংবিধানের পুনরুজ্জীবন ও একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। দুটি দাবীর পূরণের লক্ষেই অগ্রসর হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার। লক্ষ্যপূরণের পথে বাধা আসছে শুধু বাহির থেকে নয়, ভিতর থেকেও। ভুলে গেলে চলবেনা, ৭২ এর সংবিধানের ধর্ম-নিরপেক্ষতা একটি অখন্ড ধারণা। এক্ষেত্রে কোনও আপসের অবকাশ নেই।

পঁচাত্তরের আগস্টে ও নভেম্বরে, যা ঘটেছিল, তা বাংলাদেশকে রাজনৈতিকভাবে কক্ষচ্যুত করেছিল। সেই কক্ষচ্যুতি নিদারুণ ক্ষতচিহ্ন রেখে গিয়েছে আমাদের জাতীয় জীবনে। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার বিস্তার ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রীকে প্রায় প্রত্যহ হুঁশিয়ার করতে হচ্ছে তাঁর নিকটজনকে, যেন কোনও দুনীর্তির পথে তারা পা না বাড়ান। দুর্নীতির জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা যেমন দেখা যায়, সে জালের আলিঙ্গন যে কতো গভীর, তা-ও আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা।

'৭৫-এর আগস্টের মারাত্মক আঘাতের পর কেন দেশ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি, কেন আমাদের এত দীর্ঘকাল দুঃশাসন ও অপশাসনের পরাজয় ও অপমান স্বীকার করতে হল, এর কোনও সদুত্তর আমরা এখনও পাইনি। আমাদের রাজনৈতিক চেতনা কি এখনও দৃঢ়মুল নয়? আমাদের রাজনৈতিক সংগঠন কি এখনও দুর্বল? কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল দেখে কে বলবে যে, বাংলাদেশের ভোটার ভোট প্রদানে বড়ো রকমের ভুল করেছে?

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের এই জনগণের উপরই আস্থা রেখেছিলেন। জনগণই ছিল তাঁর শক্তির উৎস। তাঁর মধ্যেই বাংলার জনগণ তাদের অবিসংবাদী নেতার সন্ধান পেয়েছিল। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি চেয়েছিল, বাংলার মানুষ তাঁকে ভুলে যাক। বাংলার মানুষ তাঁকে ভোলেনি। বাংলার মানুষের শ্রদ্ধায় অভিষিক্ত আছেন তিনি, তাদের ভালবাসায় সিক্ত আছেন আজও। জাতির জনক, ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিকে যারা হত্যা করেছিল, সেই কলঙ্কের অপলোচন হয়েছে তাদের বিচারের মধ্য দিয়ে। বঙ্গবন্ধুর আসন স্থায়ী হয়ে আছে বাঙালির হৃদয়ে।

তাঁর মহাপ্রয়াণের এই দিবসে

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

"যতদিন রবে পদ্মা-যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান,
তত দিন রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান ॥"

–অন্নদাশঙ্কর রায়।

উপরি উদ্ধৃত চরণসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে ঈমানে বিশ্বাসে ধারণ করি যে, কদাপি ইতিহাসের মৃত্যু নাই; এবং ইতিহাসের সন্তান প্রতীকী শেখ মুজিব, অমর তিনি– মহাকালের পটে চিরভাস্বর।

এক.

বছরের আবর্তনে আবার এসেছে ফিরে মাস আগস্ট এবং আজ সেই অভিশপ্ত দিবস পনেরোই। নরকের দূত ওরা সপরিবারে হত্যা করেছিল মাতৃভূমি আমার বাংলার 'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান' শেখ মুজিবকে। পুনরায় ঐ ইতিহাসই সাক্ষ্য, কোটি বাঙালি আমাদের জন্যে দুঃসাহসী, দুর্জয় প্রেরণার মহত্তম উৎসস্বরূপে সেই তিনি 'বঙ্গবন্ধু', সেই তিনি নবীন এক দেশ রাষ্ট্রের 'জাতির জনক'। একাত্তরের রণক্ষেত্রে পরাজিত দুশমন ওরা – আগ্রাসী পাকিস্তানিত্বের এদেশী কুলাঙ্গার দালাল জোট, পেছুটান গোঁড়া মৌলবাদী গোষ্ঠী – অন্তরালে ওরা ষড়যন্ত্র এঁটেছিল। অতঃপর দুর্গ্রহের নিয়তি হয়ে ওদের আবির্ভাব অভিসম্পাত-গ্রাসিত ঐ পনেরোইতে। স্বভাবতই ঐ জবাবে ফিরে যাব – এমনটা তো মোটেই অকস্মাৎ হতে পারে না। কিংবা নয় নিছকই কতিপয় ক্ষমতালিপ্সুর পাপ-মতলব হাসিলের যত সব ভয়ঙ্কর হিংস্র কান্ড। প্রসঙ্গতঃ ইতিপূর্বে খানিক আভাসিত করা গেছে। এবং ইতিহাস সাক্ষ্য, কালে-কালান্তরে দেশে দেশান্তরে মেলাই এমনতর নজির রয়েছে, রয়ে যাবে। মুক্তিযুদ্ধের সফলতা-অর্জিত রেভোলিউশনের উত্তরকালে কাউন্টার রেভোলিউশনের সবছাপানো আলামতের আছর। উদাহরণত যেমন, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ফরাসী বিপ্লবের ফসল বটে সম্রাট লুইতন্ত্রের অবসান। তবে আবির্ভূত হয়েছিলেন আরেক 'সম্রাট' নেপোলিয়ন। ওদিকে আবার মাৎসনী গ্যারিবল্ডির দেশ ইতালীতে শেষ অবধি ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটর বেনিটো মুসোলিনীর সর্বগ্রাসী উত্থান। তেমনই প্রাচ্যের এই মহাদেশে একদা সুন ইয়াৎ-সেনের চীনে, সুকর্ণর ইন্দোনেশিয়াতে, কী আফ্রিকার আলজেরিয়াতে, মিশরে, মধ্যপ্রাচ্যের ইরানে একেক চেহারায় 'মুক্তি-প্রগতি' বিরোধী অপশক্তির উত্থান, এবং দখলে-নেয়া। ক্ষেত্রবিশেষে কী ভয়ংকর মৌলবাদের, জঙ্গীবাদের প্রসার।

এখন আমাদের এই বাংলাদেশ। এবং আমাদেরইতো একাত্তর - মুক্তিযুদ্ধের নজিরবিহীন অমর ব্যতিক্রমী সাফল্যের অর্জন। আবার দেশের জনমানুষ আমরাই তো শিকার মাত্র সাড়ে চার বছরের মতো কালব্যবধানে। হায়, কোথায় যে নির্বাসিত হয়ে গেল ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের সারাটা দেশজুড়ে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম'। পরের কালের কঠোর বাস্তবতায় কোন্ সাক্ষ্য দেয়, ক্যান্টনমেন্টের গর্ভ থেকে উঠে এল ওরা, সামরিক ছাউনির আশ্রয়ে সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় লকলকিয়ে উঠল রাজনীতির লেবাসে নামধারী পোলিটিক্যাল 'পার্টি'। আর তার পরের থেকে গণতন্ত্রের ভাওতা বুলি আউড়ে ক্ষমতার ঘোড়া দাবড়ে গেছে বছরের পর বছর ধরে এবং সমান্তরালে একই সাথে গোকুলে বাড়তে দেওয়া হয়েছে পবিত্র ধর্মের অছিলাতে কারবারী মৌলবাদকে।

দুই.

মিলিয়ে নিতে চাইছি, বর্ণিত এই পটপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ-বাঙালির জন্যে বিশেষ করেই প্রতীকী পনেরোই আগস্ট-কথা। ওরাতো সেই নিশি ভোরে আদপে দেহধারী মানুষ শেখ মুজিবকে হত্যা করেনি। গভীরে

ওদের ষড়যন্ত্র প্রয়াস ছিল বহমান ইতিহাস আধারের বাঙালিত্বের উচ্ছেদন, কোটি বাঙালির একাত্তর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সমূলে ধ্বংস সাধন। ফিরে আসুক মধ্যযুগীয় অন্ধকারের উদ্ভট পাকিস্তানিত্ব, কায়েম হোক প্রশ্নাতীত ফতোয়া-দাপট। বিশ্বাস করি যে, সৎ সচেতন বাঙালি মাত্রের কাছেই জানা – 'বঙ্গবন্ধু' সেই তিনি, কোন্ সে আর্দশের বিছানায় আমৃত্যু লড়াই করে গেছেন। এবং সেইখানেতে ঐ বাংলাদেশ সত্য। কখনো ইতিহাস নির্মাণ করে থাকে নির্বাচিত সেই কতিপয় প্রমুখ জনকে। তারা মহাকালের সন্তান। কখনো তারাই ইতিহাস সৃজনের কর্মটি সম্ভব করে থাকেন। আবার কখনো বা একে অপরের সম্পূরক। মহাকালের পটে এমনতর উজ্জ্বল মানুষদের কথা আমাদের জানা রয়েছে।

বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা তেমনই একজন শেখ মুজিবকে অবলোকনের প্রয়াস পাচ্ছি, যিনি একটি মুক্ত স্বাধীন দেশ- রাষ্ট্রের প্রধানতম স্থপতি। কথাটা বরং আরেকভাবে উপস্থাপন করা যাক। তাতে করে বক্তব্য আমাদের অধিকতর স্পষ্ট হবে বলে মনে করি। বিগত শতকের এশিয়া ভূখন্ড থেকেই উদাহরণ টেনে বলি,– আধুনিক তুরস্কের আতা কামালের ন্যায়, ভারতের বাপুজী গান্ধীর ন্যায় , ভিয়েতনামের আংকল হো'র ন্যায় পবিত্র এই তালিকায় সর্বশেষ উল্লেখ্য মহান জন বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

বলা বাহুল্য, বিশ্ব ইতিহাসের এই প্রকারের ত্রাতা পুরুষ যাঁরা, নিজ নাম-পরিচিতির উর্ধ্বে এবং দেশ-সীমানা ছাড়িয়ে তাঁদের অবস্থান। তখন তাঁরা মহাকালের ঐশ্বর্য-সম্পদে উত্তরিত হয়ে যান। আমাদের দুনিয়ার মানচিত্রে ক্ষুদ্রায়তন এমন একটি প্রাচ্যদেশের সেই তাঁকে পেয়েছি আমরা আপন মাঝে।

তিন .

সন ১৯৭১-এর বিশ্বপরিস্থিতির কথা বিবেচনায় আনি। সর্বত্র সর্বাধিক আলোচিত দুটি দেশ ভিয়েতনাম আর বাংলাদেশ। এক দেশে মার্কিন বিমান বাহিনীর কার্পেট বম্বিং এবং আরেক দেশে দখলদার পাকিস্তানী সৈন্যবহরের নির্বিচারে জেনোসাইড। আবার প্রতিরোধে উভয় দেশেরই গণমানুষের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। এইখানে এমন জিজ্ঞাসাটি– ইতিহাসে কদাপি কি এমন দ্বিতীয় কোন নজির রয়েছে যে, দেশে সর্বাত্মক প্রতিরোধ-সংগ্রাম সংগঠিত, উজ্জীবিত হয়েছে এবং মাত্র নয় মাসে অনুপস্থিত নেতার প্রেরণায়। (সবারিতো জানা) বাংলাদেশ ভূখন্ডে মুক্তিযুদ্ধের ঐ সময়টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দেড় হাজার মাইলের ফারাকে পশ্চিম পাকিস্তানের দুর্গম অজানা কোন এক জিন্দাখানায় মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত বন্দী। শেষ ক্ষণের প্রহর গুণছেন তিনি। তাহলে প্রশ্ন–ঈমানের, কী সেই প্রেরণা যা স্বদেশ মাতৃভূমির লড়াকু কোটি বাঙালিকে প্রাণিত করে তুলেছিল?

ইতোমধ্যে অবশ্য গড়িয়ে গেছে কয়েক দশকের মতো কাল সময়। তবে ভুলি নি আমরা বঙ্গবন্ধুর সেই যে বিশ্বাস-প্রাণিত মহৎ উচ্চারণ– "ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা, জয় বাংলা "বারংবার করেই কিন্তু আমরা বিবেচনাতে আনব, মরণজয়ী ঐ মন্ত্র যেমন আমাদেরকে অকুতোভয়, দুঃসাহসী করে তুলেছিল। শেখ মুজিব নামের মানুষটি তখন আর রক্তমাংসের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দেহধারী ব্যক্তিমানুষ মাত্র নন, আমাদের সমুদয় আকাঙ্খা আর স্বপ্ন নিয়ে দৃঢ়মূল বিশ্বাসে উত্তরিত হয়ে গেছেন তিনি।

প্রাসঙ্গিকতার জের টেনে আবারো তবে বলে নিতে চাইছি-আজ শোক দিবসের উদযাপন বটে; তবে এতেই কিন্তু ইতি নয়। অবকাশ পাওয়া গেছে, বারংবার করেই অবলোকনের প্রয়াস পাচ্ছি, সেই তাঁকে, জনক তিনি, সামনের পানে আমাদের যাত্রা পথের দিশারী।

এইখানেতে একটি প্রশ্নঃ প্রকৃতির রাজ্যেই হোক, কিংবা মর্ত্য মানবজীবনেই হোক, ইহজাগতিকতার এলাকাতে দৈবের ভূমিকা কতটা গ্রহণযোগ্য? কিংবা কোনই কার্যকারণ হেতু নেই, এমন আকস্মিকতার ভূমিকা? যুক্তি বিজ্ঞান মোটেই তা সমর্থন করে না।

অনুসন্ধিৎসু পন্ডিতজন সন্ধান করেন, অবশ্য করেই বাস্তবতার পটভূমিতে ইতিহাস যে সম্ভূত হয়ে ওঠে, নির্মিত হয়, বাঁক নেয় এবং ইতিহাসের গর্ভ থেকে যে মহানায়কের জন্য তথাকথিত দৈব বা আকস্মিকতা

সেক্ষেত্রে কদাপি মূলে কাজ করে না। তাই হঠাৎ করেই মাহেন্দ্র লগ্নে কোন অন্তরীক্ষ থেকে তিনি অবতীর্ণ হলেন, এমনটা হয় না। অবতারের ঠাঁই রয়ে যাবে কল্প পুরাণে, ইতিহাসে নয়। এই প্রেক্ষিতে আমাদের শেখ মুজিব কথা।

চার.

১৯৬৬-তে যখন বাঙালির বাঁচার সনদ ছয় দফার ঘোষণা এবং ১৯৭১-এর সাতই মার্চ ঢাকায় রমনা রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে তাঁর যে সেই ঐতিহাসিক ভাষণ– এ দুয়ের মাঝে সময় গড়িয়েছে পাঁচ বছর। আমরাই প্রত্যক্ষ করেছি, এই স্বল্পকাল ব্যবধানেই মানুষটি নেতৃত্বের আর ভালোবাসার কোন অভ্রংলিহ শিখর চূড়ায় যেনবা ধুমকেতু বেগে উত্থিত হয়ে গেলেন। সরাসরি আপন অভিজ্ঞতা থেকেই জানাতে চাইছি বিশেষ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী, সংগঠক কখন যে তিনি জনমত নির্বিশেষে সারাটা দেশের তাবৎ জনমানুষের হৃদয়ে বঙ্গবন্ধুর আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। অবশ্যই ইতিহাসে আকস্মিকতার অবকাশ নেই। এবং মাত্র ঐ কয়েক বছরেই বাংলাদেশের কেমন যে বিস্ময়কর দ্রুততায় কাল-রথচক্রের ব্যাপক বিশাল আবর্তন ঘটে গেছে।

অনুধাবন করতে চাই যে, কোটি জনমানুষের নিশঙ্ক নিশ্চিত নির্ভর কোথায় সেই জননেতা, এমনতর ভাষায় নির্দেশ ঘোষণা করতে পারেন, "প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।" আমরা আর পেছনে ফিরে তাকাই নি; বজ্রকণ্ঠে তার দুর্জয় আহবান শুনেছি–"সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না.....এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। সেই দিন কি তিনি একক এক অতিমানুষে পরিণত হয়েছিলেন? হয়তো হবেনও বা। ইতিমধ্যে কাল গড়িয়ে যে দুরত্বে আমরা এসেছি, এখন নির্মোহ বিবেচনায় বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ঐ ভাষণটির বিশ্লেষণ করবার অবকাশ পাব। তবে হ্যাঁ, আবেগ অবশ্যই ছিল। এবং সারাটা দেশ জুড়ে জনমানুষ একান্ত চিত্তে তাই চাইছিল। কিন্তু ব্যাপারটা হঠাৎ করেই তো তাৎক্ষণিক এক দিনের নয়। দীর্ঘকালব্যাপী তৃণমূল অবধি সাধারণের বঞ্চনা, ক্ষোভ, প্রতিবাদ, ইত্যাকার এ সমস্ত কিছুই সংগঠিত করে একটি বিশেষ স্রোতমুখে বইয়ে দেয়ার বিশাল কর্মকান্ড রয়েছে। আসলে বাংলাদেশের তৎকালীন বহমান ইতিহাস কাজ করে গেছে শেখ মুজিব নামের মানুষটির মাধ্যমে।

আপন জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি তিনি দুঃশাসনের নির্যাতনের শিকার। হেতু-স্বদেশ, স্বদেশের মানুষের স্বার্থে কর্মসাধন। কতো অসংখ্যবার যে বৈরী সরকারের হুলিয়া তাঁকে দেশের এ প্রান্তর থেকে ও প্রান্ত অবধি তাড়া করে ফিরেছে। প্রায়শঃ কারাবাস, কারাভ্যন্তরে কখনোবা প্রতিবাদ–অনশন; বাইরে রাজপথে যখন দুঃশাসনের সরকার বিরোধী মিছিলে সামনের সারিতে নেতৃত্বে, তখন পুলিশের নির্বিচারে এলোপাথাড়ি লাঠি চার্জ; এই সব যেনবা তাঁর অঙ্গসত্যের সাথে মেশামেশি হয়ে গিয়েছিল। প্রচন্ড সাংগঠনিক ক্ষমতা, নির্ভয় অমিত দুঃসাহস, আর দেশবাসীর জন্য গভীর ভালাবাসা; বিশ্বাসে ধারণ করি যে–এই তিনে মিলে মানুষটি শেখ মুজিবুর রহমান। প্রতিদানে দেশবাসীও তেমনই তাঁকে ঐ ভালোবাসারই যেন বা অপর নাম বঙ্গবন্ধু অভিধায় হৃদয়ে আপন করে নিয়েছে।

পাঁচ.

নতুন মিলেনিয়ামের পয়লা দশকের প্রান্তে আজ সন ২০১০-এর পনেরোই আগস্ট। ঘাতক দানবের আঘাতে নিহত জাতির স্থপতি জনক তার স্মরণে আমরা আজ শোক দিবস উদযাপন করছি। বরং এমন করে চিহ্নিত করি ; বাঙালির ইতিহাসে মহামানবের মহাপ্রয়াণ দিবস আজ। বলবার অপেক্ষা রাখে না যে, এ নয় মোটেই আনুষ্ঠানিকতার ছক বাধা এক আয়োজন। গভীরে রয়েছে অনেক। সেইখানেতে কথা কয় হাজার বছরের বাংলা, বাঙালিত্ব। প্রস্তাব যে, তার ইতিহাসে পাঠ নেব। এবং নিজের কাছেই এমন জিজ্ঞাসার তাড়না, এমনটাই কি শেষোবধি নিয়তি-বিধাতার নির্দেশ,–মর্ত্য মানুষের ত্রাতা মহোত্তম, অনেকেরই তাঁদের দেহাবসান নারকী পাপ-অপশক্তির করাল গ্রাসে।

এমত অতীব প্রাসঙ্গিক কতিপয় নজির উদ্ধৃত করতে চাইছি ঃ সেই কবেকার দূর অতীতে গ্রীসের এথেন্স নগরীতে হেমলক বিষপানে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল গুরু, অভিভাবক মহামতি সক্রেটিসকে। সক্রেটিস থেকে 'যিশু-যাঁর মহান বানী "Love thy neighbour"। যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। কালের সাগর পাড়ি দিয়ে আসি তবে ফরাসী দেশে। ফরাসী বিপ্লবের উদ্বোধন লগ্নের অন্যতম প্রতিভু সেইন্ট যোয়ান অব আর্ক; তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল। এবং তারপর উনিশ শতকে People এর কণ্ঠস্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন, বিশের শতকে ভারতে অহিংসা মন্ত্রের ব্রতধারী মহাত্মা গান্ধী, মার্কিনী দেশ যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ বা নিগ্রো জনের বর্ণ-স্বাধিকার দাবির প্রবক্তা মার্টিন লুথার কিং প্রমুখ দেশ-দেশান্তরে এমনতর এদের ওপরে নেমে এসেছে হত্যা নিধনের নৃশংসতা। এখন এই কাতারে সর্বশেষ উজ্জ্বলতম সংযোজন আমাদেরই আপন ঘরের, জয় বাংলার শেখ মুজিব।

আজকের বিশেষ এই দিনে স্মরণ করছি তাঁকে; নবীন এ জাতির জনককে, স্থপতিকে। এবং বিশেষ করে এই বর্তমানের ক্রান্তিলগ্নে অবশ্য বারংবার করেই দীক্ষা আমাদের তাঁর সেই উদাত্ত আহবানে, পুনরুদ্ধৃত করি– "আমি, বাঙালি / বাঙলা আমার দেশ। বাংলা আমার ভাষা।"
শোক নয়। আজ আমরা এই দীক্ষামন্ত্রের, বিশ্বাসের, জয়গান গাই।

নতুন প্রজন্মের দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড

১৫ আগস্টের হত্যাকান্ড এক গভীর ষড়যন্ত্রের ফসল বলে আমি মনে করি। শুধুমাত্র দেশের স্বাধীনতা বিরোধীরা নয় এতে আন্তর্জাতিক মহলের ভূমিকা ছিল বলে মনে হয়। এ হত্যাকান্ড বাঙালী জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে–তাই আমরা আজও উঠে দাঁড়াতে পারিনি। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে আমাদেরও একজন মেন্ডেলা থাকতেন আর দেশটা হতো স্বপ্নের সোনার বাংলা। আট বছরের রাসেল ও মিসেস মনির (শেখ মনি) অনাগত শিশুটির কথা মনে হলে আজও যে কোন বিবেকবান মানুষের চোখ ভিজে ওঠে। **নুজহাত চৌধুরী (শম্পা), সহকারী অধ্যাপক, বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়।**

১৫ আগস্টের হত্যাকান্ড কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। কারণ কোন দেশে জাতির পিতাকে হত্যা, সে জাতিকেই হত্যার সামিল। **আজিজুল হক, সরকারী মাদ্রাসা-ই-আলিয়া** ।

আসলে এ ঘটনা মূল্যায়নেরও অযোগ্য। যিনি আমাদের স্বাধীনতার সূর্য উপহার দিলেন তাকে এভাবে চলে যেতে হল। আর তার স্বপ্নপূরণের ন্যূনতম সুযোগও তিনি পেলেন না। এটা সত্যি মর্মান্তিক। আর অবুঝ শিশু যে কিনা ফেরেশতার প্রতিমূর্তি, তাকে দেখে পাথর হৃদয়ও গলে যায়, অথচ সেই নিষ্পাপ শিশু রাসেল ঘাতকের বুলেট থেকে রেহাই পায়নি। যারা শিশু, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে হত্যা করেছে তারা কোন হৃদয়ের সেটিই আমি চিন্তা করি। **কামরুল, বিবিএ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।**

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের হত্যাকান্ড ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্যরা যে নির্যাতন করেছে তার চেয়েও ভয়াবহ। **আইরিন হুদা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।**

এ হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অবদান ও অস্তিত্বকে অস্বীকার করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। তবে খুনীদের এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কারণ "মুজিব" আর "বাংলাদেশ" ভিন্ন কোন প্রত্যয় নয়। ১৫ আগস্টের হত্যাকান্ড রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং শেখ মুজিবের নাম নিশানা এ দেশ থেকে মুছে ফেলার জন্যই তার উত্তরসুরীদের হত্যা করা হয়েছে। শেখ মুজিবের মৃত্যু আমাদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। তবে মুজিবের আদর্শকে ধারণ করে সেগুলোর বাস্তবায়ন সম্ভব বলে আমি মনে করি। **মীর ফজলে রাব্বি, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।**

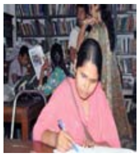

মানুষ মাত্রই ভুল করে। বঙ্গবন্ধুরও হয়তো ছোটখাট ভুল থাকতে পারে। কিন্তু হত্যাকান্ডতো কোন সমস্যার সমাধান নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ঘটেছে। তবে স্বপরিবারে এমন হত্যাকান্ড খুবই কম হয়েছে। যার নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেলাম তাঁকে এভাবে হত্যা করা ঠিক হয়নি। আর তার পরিবার-পরিজনকে হত্যার ব্যাপারটি একেবারেই ক্ষমার অযোগ্য। কিছু মানুষতো জীবন কী, রাজনীতি কী, এসব কিছু বোঝার পূর্বেই খুন হলো কিছু বর্বরের হাতে। রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম অথবা এ পরিবারে বেড়াতে এসেছে-এ অপরাধে কেন কাউকে জীবন দিতে হলো–এটি আমার কাছে অস্পষ্ট। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ফলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ভিন্নভাবে রচিত হয়েছে। **শিল্পী বেগম, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**

বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড আমাদের জাতীয় জীবনে অভিশাপ। তিনি শুধু কোন

দলের নেতাই ছিলেন না, বরং দেশের আপামর জনগণের নেতা ছিলেন। তিনি জনগণের মধ্যে জাগ্রত করেছিলেন জাতীয়তা ও স্বকীয়তাবোধ। তিনি এদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে নেতৃত্ব না দিলে এদেশ এখনও পরাধীন থাকতো। **মোঃ সবুজ হোসেন, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।**

ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে বলতে পারি, ৭৫ এর ১৫ আগস্টে ব্যক্তিমুজিবকেই হত্যার মূল উদ্দেশ্য ছিল না। এ হত্যার মাধ্যমে তাঁর আদর্শকে হত্যা করা হয়। সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য সামনে রেখে তাঁকে এবং আত্মীয় পরিজনসহ পুরো পরিবারকে ধ্বংস করা হয়। ১৯৭১ সালের পর থেকে স্বাধীনতার মূল চেতনাকে হত্যার যে ষড়যন্ত্র ও কার্যক্রম চলছিল বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড ছিল তার চূড়ান্ত অধ্যায়। আমার প্রশ্ন, আজকের দিনে রাজাকারের গাড়িতে পতাকা উঠে কেমন করে? স্বাধীনতার পর শেখ মুজিব সরকার গঠন করেন একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দুর্ভিক্ষপীড়িত পরিবেশে। দেশ গঠনে তিনি পেয়েছিলেন খুবই অল্প সময়। যদি একটু সময় পেতেন, আজকে এদেশে সমস্যার যে পাহাড়ের উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি তা হয়তো হতো না। আর নিরীহ, নিরাপরাধ ব্যক্তিদের হত্যাকান্ডের ব্যাপারে বলা যায় এ হত্যাকান্ড মধ্যযুগের চেয়েও বর্বরোচিত। শিশু হত্যা কোন ধর্মেই স্বীকৃত নয়। হত্যাকারীদের ধারণা ছিল তাঁর বংশধর কেউ বেঁচে থাকলে ভবিষ্যতে তাঁর আদর্শ হয়তো বাস্তবায়নের সুযোগ পাবে। তাই সবাইকে মেরে ফেলা হয়েছে অত্যন্ত পরিকল্পিত উপায়ে। **এস. এম. রেজাউল করিম (রেজা), প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।**

নারী ও শিশু হত্যা ইসলামে নিষিদ্ধ। যারা এ হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে তাদের ভিতর মনুষত্ব আছে কিনা সন্দেহ। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে আজকে আমাদের দেশে যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, তা থাকতো না। তিনি বাংলাদেশকে একটি দুর্নীতিমুক্ত ও স্বপ্নের সোনারবাংলা রূপে গড়ে তুলতে পারতেন। আমরা তাঁর ও তাঁর সাথে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করি। **আব্দুল্লাহ আল ফারুক (অপু), দাখিল বিভাগ, আলিয়া মাদ্রাসা, ঢাকা।**

বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আমি যা শুনেছি, তাতে আমি মনে করি উনি একজন আদর্শ নেতা ছিলেন। আমি আজ তাঁর মতো একজন নেতার অভাব অনুভব করি। **কাউসার আহমেদ, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং,বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।**

একটি দেশের উন্নয়নের জন্য একজন নেতা প্রয়োজন। যদি আমরা ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ এবং মালয়েশিয়ার মাথাপিছু আয় চিন্তা করি তবে আমরা দেখতে পাব দুটি দেশ প্রায় একই রকম ছিল। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে কোথায় মালয়েশিয়ার অবস্থান আর কোথায় বাংলাদেশ? তাদের মাথাপিছু আয় বাংলাদেশের তুলনায় কতগুণ বেশি! সেটি শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি মাহাথির মোহাম্মদের কারণেই সম্ভব হয়েছে। আমি মনে করি বাংলাদেশের এরূপ একজন নেতা দরকার ছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর বেঁচে থাকলে আমাদের এ প্রত্যাশা পূরণ করতে পারতেন। **আসিফ, বিবিএ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।**

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের হত্যাকান্ড ছিল ইতিহাসের নৃশংসতম একটি ঘটনা। এ ঘটনার ফলে ব্যাহত হয়েছে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামাজিক ন্যায়বিচার। তাঁর হত্যাকান্ডের পর আমাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে নেতৃত্বের শূণ্যতা। তাই বাংলাদেশ এখনও তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসাবেই রয়ে গেছে। **শিরিন আক্তার, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**

তাঁর নিজস্ব গন্তব্যে

অসীম সাহা

খুব ধীরে ধীরে তিনি সিঁড়ির প্রান্তে এসে দাঁড়ালেন।
মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে তখনও প্রতিধ্বনিত হয়নি বন্দনাগান
চরাচরকে এতো শান্ত, এতো কোলাহলহীন মনে হয়নি আর কখনো;
যেন পৃথিবীতে এরকম শান্তি কখনো ছিলো না।
এ-সময়ে আকাশের পর্দা ফাটিয়ে ভয়ানক বেগে
গর্জন করে উঠলো মৃত্যু;
তারই শব্দে কেঁপে উঠলো পৃথিবী।
আর্তনাদ আর কোলাহল জড়াজড়ি করে এমন প্রবল হয়ে উঠল যে,
তিনি আর ভেতরে স্থির থাকতে পালেন না।
রাত্রির পোশাকেই ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে
সিঁড়ির প্রান্তে এসে দাঁড়ালেন।
হাতে তখনো তাঁর প্রিয় পাইপ;
চোখের চশমায় প্রতিফলিত বিস্ময়কর আলো
একবার ঝল্‌সে উঠেই পিছ্‌লে পড়ে হারিয়ে গেলো অন্ধকারে।
হাওয়ার ভেতর তাঁর বজ্রকণ্ঠ আছ্‌ড়ে পড়লো–কে?
তখন জলপাই রঙের পোশাকে আবৃত
কয়েকজন বিপথগামী সৈনিক অস্ত্র হাতে চিৎকার করে উঠলো, "ঐ তো,
ঐ তো বিশ্বাসঘাতক, হত্যা করো ওকে।"
একটি পাতা বৃক্ষ থেকে উড়ে এসে ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে
উপুড় হয়ে পড়ে রইলো তাঁর পায়ের কাছে।
এক ঝলক বাতাস এসে তাঁর চুলের ওপর আছড়ে পড়লে
তিনি হাত দিয়ে তা পেছনে সরিয়ে দিয়ে
বজ্রগম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন–"কী চাই তোদের?"
সঙ্গে-সঙ্গে একটি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র গর্জন করে উঠলো।
রক্তাক্ত-ক্ষতবিক্ষত দেহে তিনি লুটিয়ে পড়লেন সিঁড়ির ওপরে।
দিগন্ত থেকে দিগন্তে যাদের উন্মত্ত ক্রোধ বিকীর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়লো,
তারা সেই বিশালাকায় দেহকে সেখানে ফেলে রেখে
ভোরের আলোয় দ্রুত সরে গেলো দৃশ্যের আড়ালে;
আর অস্ত্রের ভয়ানক গর্জনে নিদ্রামগ্ন কাকেরা তোলপাড় করলো মহাদিগন্ত।
হিমেল হাওয়ার চাপা গোঙানি ভারাক্রান্ত করে তুললো ভোরের বাতাস;
নিথর দেহের ভারে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই ছোট্ট নদী–
যার উত্তাল জলে লাফিয়ে পড়া ছোট্ট কিশোরের আনন্দিত অনুভবে
একদিন হেসে উঠেছিলো দু'পাড়ের মাটি।
আজ তার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে অবশ হয়ে এলো দেহ।
মনে হলো, আহা, তাঁর কতো আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হলো না,
জীবন আর যৌবনের যে-দিনগুলো
লোহার খাঁচায় বন্দিত্ব বরণ করতে-করতে শূন্যতায় ডুবে গেলো,
রবীন্দ্রনাথের একটি গানকে চিরকালের করে তুলতে যে-জীবন
মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে-করতেও থেমে গেলো মধ্যপথে;
যারা এক অর্ফিয়ুসের বীণার অনুরণন থামিয়ে দিতে
রক্তপাতকেই নির্দিষ্ট নিয়তি বলে ঘোষণা করে দিলো,

তিনি শেষবারের মতো হাত তুলে তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন।
শুধু ভূমিপুত্র ও কন্যারা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো ধানের ক্ষেতে;
মাথার মাথাল ফেলে দিয়ে তারা বুক
চাপ্‌ড়াতে চাপ্‌ড়াতে বিলাপ করতে লাগলো;
ধানের শীষের ভয়ার্ত কাঁপনে তাদের বিলাপ
ভাসিয়ে নিয়ে গেলো দক্ষিণের হাওয়া;
একাত্তরের মতো আর একবার বুটের শব্দে
কেঁপে উঠলো স্বদেশের মাটি।

অবশেষে যেই নগরীতে তাঁর জীবন বয়ে গেছে বিদ্যুতের বেগে
সেই প্রিয়তমা নগরী তাঁকে বিদায় জানালো চিরকালের জন্যে।
কিন্তু যেই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুরন্ত কিশোর
জানিয়ে দিয়েছিলো স্রোতস্বিনীকে–সে বয়ে যাবে
পৃথিবীর সর্বশেষ সীমান্ত অবধি,
সেই মধুমতী কেঁদে-কেঁদে আকুল হলো;
কেবল সে-ই তাঁকে পরম আদরে টেনে নিলো তার বুকে–
যেন এক ক্ষুধার্ত মাতৃহৃদয় ফিরে পেলো তার হারানো সন্তানকে।
ঢেউয়ের তালে-তালে লক্ষ-লক্ষ মানুষের করুণ বিলাপে
ঝুরঝুর করে ঝরে পড়তে লাগলো দু'পাড়ের মাটি,
তরঙ্গের শীর্ষদেশে একটি স্বাধীন স্বদেশ তার দেহ ও আত্মাসহ
এক-একা ভেসে যেতে লাগলো তাঁর জন্মভূমির দিকে;
আর মধুমতীর দুই তীর কান্নায় ভাসিয়ে দিয়ে
মৃত্যু তাঁকে পৌঁছে দিলো তাঁর নিজস্ব গন্তব্যে।

মানব মহান

বেলাল চৌধুরী

হাজার বছরে হয়তো আসেন তাঁরা, হাতে গোনা দুই একজন
সুকৃতিতে যান ছাপিয়ে অনেক দূর, নিজেরাই নিজেদের–
মানব জীবন ধন্য করে মানব মহান; পতিত জমিন ভরে তোলেন
আবাদ করে সোনার ফসলে!

এমন করেই এসেছিলেন দশদিক আলো করে, শেখ বংশজাত
দুর্গম ও সুদুর পাড়াগাঁয়ের এক জরাজীর্ণ ঘরে মা বাবার কোল জুড়ে,
–জানি মানুষের বয়স বাড়ে, পাল্টায় পরিবেশ মাথা তোলে চারাগাছ ....

নদীরও কি বয়স বাড়ে ? জানি না। তবে সর্বদাই সে যে চঞ্চলা একরোখা ও বিদ্রোহিণী
একটানা তার বেপরোয়া কুলকুল স্বরে টের পেতে দেরী হয়না মোটেই
কখনো রুদ্রমূর্তি ভয়ঙ্করি, গতি তার দুর্বার ছিপছিপে, সমান্তরালে চলা
বঙ্কিম মধুমতি ....

নিজের নামের মতোই যেমন সুন্দরী আবার নিজেরই বুক চেরা বাইগার
দু'পাশে তার হতশ্রী কুল কিনারা ঘিরে ঝাপসা তরুশ্রেণী
হরেক রকম দৌরাত্ম্যের মাঝে দেমাক ভারী চলন তার
চারিদিকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অনটনের বুক টনটন ধূসর নিসর্গ ছবি
প্রথম প্রহরে ক্লিষ্ট মলিন মুখাবয়বগুলি হৃদয়ঙ্গম করে
বুঝেছিলেন তিনি এইসব 'মূঢ় মূক মস্নান মুখে দিতে হবে ভাষা'

চিরশোষিত জনের মুখে ফোটাতে হবে গোলাপ হাসি রাশি রাশি
– আর সে দুরূহ কাজে ব্রতী হতে হলে হতে হবে তাকে
অকূল সমুদ্রে দুঃসাহসী নাবিক, একাগ্রচিত্ত সংগ্রামী মাঝি

আপস-রফার পথ তাঁর নয়, দুর্গম পথের অভিযাত্রী তিনি
পদে পদে বাধা, সংগ্রামের পর সংগ্রামেই কেটেছে জীবন
কোথায় স্ত্রী কোথায় বা ছেলেমেয়ে কোথায় বা বাবা-মা–ভাইবোন আত্মীয় স্বজন

সারাদেশের যিনি, সারা জতির যিনি, শতাব্দীর সবচেয়ে দীর্ঘদেহী মানুষটি তিনি
দোষে-গুণে নিখাদ বাঙালি, নীলিমার মতোই উদার অসীম অমেয়
কোনো লাভালাভ ক্ষয়ক্ষতি লোভ পক্ষপাত টলাতে পারে না তাঁকে

সমস্ত বাধার বিন্ধ্যাচল গুঁড়িয়ে এগিয়ে চলার মানুষ তিনি
ঋজু টান টান চির উন্নত শির, নিতান্তই সহজ সরল দেশপ্রেমিক

সমগ্র জাতিকে ঋণগ্রস্থ রেখে সঙ্গী সাথী সহযাত্রীদের নিয়ে
পাড়ি জমালেন হাসিমুখে নিজের বুকের তপ্ত শোণিত ঝরিয়ে
–তবু ফোটে যেন হাসি চির শোষিত জনের মুখে

বাংলার মানুষ বড় দুঃখী, বাংলার মানুষের চাওয়া খুবই কম
তারা যেন পারে দেখতে একটুখানি সুখের মুখ, হাসতে পারে মনের সুখে
মাত্র এটুকুই ছিল তাঁর অকৃত্রিম ঐকান্তিক বাসনা সামান্য!

তুমি আছো ধ্রুবতারা

শিহাব সরকার

অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে দশকে দশকে
টলে পড়ে বর্বর আঁধারের দানবেরা,
তমসার থোকা থোকা বিষফল
একদিন পচে গলে গাছ থেকে খসে পড়ে

অরণ্যের অন্ধকারে জাগেনি কি পথরেখা?

শ্রাবণের ভোররাতে প্রলয়-তমসার সুনামি
গিলে নিয়েছিলো আমাদের সব স্বপ্ন-সুষমা,
দেখেছি কালো পিশাচের নৃত্য
যুদ্ধশেষের নতুন, রৌদ্রস্নাত উন্মুখ বাংলায়।

সহসা অন্ধকারের থাবা খুবলে নিয়েছিলো
আমার মাংসমজ্জা, তুলে নিয়েছিলো চোখ
জিভ-কাটা মানুষের আর্তনাদে বাতাস গিয়েছিলো থেমে,
টুঙ্গিপাড়ার একটি কবরে সেদিন নক্ষত্রের নিঃশব্দ সমাধি,
বত্রিশের সিঁড়িতে রক্তমাখা বুটের প্রতিধ্বনি
অনাথ চশমাটি পড়ে ছিলো একপাশে।

তখনো প্রিয় পাইপে ছিলো বজ্রমুঠির শান্ত উত্তাপ।

তারপর সন্ধ্যার আকাশে একটি নতুন নক্ষত্র
কেউ কখনো দেখেনি এই তারা,
রাত্রি যতো গাঢ় হতে থাকে, ততো ফুটেছে তারার দ্যুতি
ভোরের আকাশে নক্ষত্র জ্বলে থাকে অবিচল,
কে আমাদের রুখবে, আদিম অন্ধকার মরে গেছে
হায়েনারা হেসে উঠবে না আর।

ঐ যে, নক্ষত্র জ্বলে আছে ভোররাতে
দুঃস্বপ্ন থেকে মরচে ঝরে পড়েছে,
বুক ভরে শ্বাস টানি আমি
ঘোর অমাবস্যায় পৃথিবী ভাসায় তারার জ্যোতি।

শেখ মুজিবুর রহমান

- মুন্সী ফয়েজ আহমদ

উৎসবে, পালা পার্বনে,
সুখে-দুঃখে, নানা আয়োজনে-
মনে পড়ে কত প্রিয়জনে।
চোখের আড়ালে আছে যাঁরা-
সারি সারি আজ উঁকি দেয় তাঁরা।
সব ছেড়ে উজ্জ্বলতম একজন-
রক্তে মাংসে তাঁরে জানিনি তেমন।
দিনে-দিনে, তিলে-তিলে তাঁরে-
মনের মাধুরী দিয়ে গড়েছে এ-মন।
আপনার চেয়ে আপন সে-জন,
প্রিয়জন মাঝে সবচেয়ে প্রিয়জন।
আকাশ ছুঁয়ে ঋজু দন্ডায়মান-
শেখ মুজিবুর রহমান।

উৎসবে, পালা পার্বনে,
সুখে-দুঃখে, নানা আয়োজনে-
মনে পড়ে কত প্রিয়জনে।
স্মৃতিতে জাগে যত প্রিয় শিক্ষকের মুখ
দলে দলে তাঁরা সবাই আসুক।
সর্বাগ্রে দেখ শ্রেষ্ঠতম এক শিক্ষক-
ছিলেন না তিনি শ্রেনী কক্ষের অধ্যাপক।
নিজেকে চেনার শিক্ষা দিয়েছেন তিনি ;
আপন শক্তিকে জানার দীক্ষা দিয়েছেন তিনি ;
অধিকার লড়ে নাও শিখিয়েছেন তিনি ;
জাতিকে অহঙ্কারে জাগিয়েছেন তিনি।
প্রত্যয়ে দৃপ্ত, গৌরবে মহীয়ান
শেখ মুজিবুর রহমান।

উৎসবে, পালা পার্বনে,
সুখে-দুঃখে, নানা আয়োজনে-
মনে পড়ে কত প্রিয়জনে।
পথ প্রদর্শক প্রিয় নেতাদের কথা মনে হয়।
একে একে আসে স্মৃতির পাতায়, কানে কানে কথা কয়।
সবারে ছাড়িয়ে দেখ কিংবদন্তী এক নেতা-
সকল নেতার নেতা তিনি বাংলার ত্রেতা।
কাল বোশেখীর দূর্দম ঝাপটার মত
মেঘমন্দ্র, গুরু গম্ভীর আহবানে তাঁর
দূর হয়ে যায় জীর্ণ, পুরাতন, মুমুর্ষু যত।
পথের দিশারী, ছিল সে যে সদা জাগ্রত।
লক্ষ্যে অটল, সদা আগুয়ান-
শেখ মুজিবুর রহমান।

উৎসবে, পালা পার্বনে,
সুখে-দুঃখে, নানা আয়োজনে-
মনে পড়ে কত প্রিয়জনে।
পূর্ব পুরুষ যত প্রিয় পিতা, পিতামহে মনে পড়ে।
স্মৃতির মিছিলে আজ একে একে ভিড় করে।
সব ভিড় ছেপে দেখ একজন সেই পিতা-
বিশাল বক্ষে ভালবেসে যিনি সকল শিশুর মিতা ;
চোখে মুখে যাঁর সদা আঁকা দেখ মায়া আর মমতা ;
সন্তান যাঁর মুক্তি পিয়াসী আপামর জনতা ;
যাঁর হাত ধরে হাঁটি হাঁটি পা-পা থেকে পেয়েছি এ -স্বাধীনতা।
চারিদিকে আজ কবি শিল্পীরা করে তাঁরই কথকতা।
সেই মহাপিতা মৌন মহান-
শেখ মুজিবুর রহমান।